বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

রংগলাল সেন
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। আর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে ৯২ হাজার পকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের "বিজয় দিবস" রুপে প্রতি বছর পালিত হয়। বিশ্বের কোন দেশেরই স্বাধীনতা অর্জন অকস্মাৎ হয়নি। এর থাকে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বললে যেকোন সংগ্রাম, আন্দোলন ও বিপ্লবের থাকে সুস্পষ্ট সামাজিক পটভূমি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মোটেই এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মূলত একটি বিপ্লব। কারণ, ১৯৪৭ সালে ধর্ম- সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রসত্তার মূলে কুঠারাঘাত করে ১৯৭১ সালে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ইহজাগতিক জাতিসত্তার ভিত্তিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার সামাজিক পটভূমি সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিকে মূলত চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। এসব হল: বাঙালি আদিজাতিগত এককের উদ্ভব, বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি মুসলিম ও পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, এবং স্বাধীন ও সর্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। উল্লেখ্য, নিবন্ধটি কলেবর সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে শুধু শেষোক্ত দু'টি পর্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে যখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। কিন্তু পরিণামে সে আশা পূরণ হয়নি। ভারত-বিভাগের আগে ও পরে বার বার সাম্প্রদয়িক দাঙ্গা সংগঠিত হওয়ার কারণে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিশ লাখেরও বেশি বাঙালি হিন্দু ভারতের পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা ও আসামে শরণার্থী হিসাবে চলে আসে। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাজার ও সেবামূলক খাতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সুযোগ আংশিকভাবে বাঙালি মুসলিমদের কাজে লাগে। বাঙালি মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে সহজে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্য ও নিস্তরে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। তারা, বিশেষ করে, শিক্ষকতা, ডাক্তারী ও আইন ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হয়। পক্ষন্তরে, পাকিস্তানের সরকারি প্রশাসনের উচ্চস্তরে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিমদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রস্থল তথা পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে এসে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। এমন কি, পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি মুসলিম অথবা ভারতের উত্তর ও মধ্যাঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের করায়ত্ত হয়। একদিকে এদের ছিল ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। ১৯৬০ সালের এক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার অপ্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল বড় বড় ব্যবসা ও শিল্প ছিল সেসবের মধ্যে মাত্র একটি ছাড়া সব কয়টিতেই অবাঙালি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আঞ্চলিকতার মনোভাবের অন্তনিহিত কারণ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারত থেকে আগত মুসলমানরা আগের হিন্দু ও বৃটিশদের মতোই পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিমদের আঞ্চলিকতা ও আত্মীয়তা বন্ধন পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ আমলা ও বড় ব্যবসায়ীর মধ্যকার সম্পর্ককে জোরদার করে, যেখানে বাঙালি মুসলমানদের আসলেই কোন অবস্থান ছিল না। অধিকন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের আইন শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এভাবে ক্রমাগত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বাঙালি মুসলমানদের অবস্থান অবনমিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম কয়েক বছর এরুপ বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি বাঙালি মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। যেহেতু প্রথম দিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় সেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের দিকটি তাৎক্ষণিকভাবে উপেক্ষিত থেকে যায়। বাঙালি মুসলিম এলিটবর্গের সাথো সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কেননা তাদের মধ্যে যোগোাযোগ তখনও বিছিন্ন হয়নি। অপরদিকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু সমাজের মধ্যস্তর থেকে ব্যাপক সংখ্যক লোকের বাস্তুত্যাগের কারণে সৃষ্টি শূন্যস্থান পূরণ করতে তখন বাঙালি মুসলিম এলিটবর্গ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় নিজেদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস পায়। এ ক্ষেত্রে তারা অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়ে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সমাজিক কাঠামোর উচ্চ স্থান মুখ্যত অবাঙালি মুসলিমদের দ্বারা পূর্ণ হয়। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আংশিক হলেও বাজার ও সেবামূলক ক্ষেত্রে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে বাঙালি মুসলিমনরা ভাগ বসাতে পেরেছিল। এর ফলে উদীয়মান বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৫১-১৯৬১ দশকের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ থেকে ১৮ ভাগে উন্নীত হয়। ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহরের একা নমুনা জরিপে ধরা পড়ে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে এসেছে; যাদের শতকরা ৯৩ ভাগের মাতৃভাষা বাংলা এবং শতকরা ৫০ ভাগের পিতা ম্যাট্রিক পাশ নয়, কিংবা তাদের লেখাপড়া অতি সামান্য। এ ভাবে আগের চেয়ে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু দেশত্যাগের কারণে সৃষ্টি শূন্য পদে শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তরা স্থান করে নেয়। এর পাশাপাশি এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে আগে যারা সমাজের মধ্যস্তরে অবস্থান করে নিতে পেরেছিল তারা সীমিত সুযোগের কারণে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এর ফলে সমাজ পরিবর্তনে বাঙালি মুসলমানদের পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। তাদের মধ্যে সমকালীন আন্তঃসংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রকাশ ঘটে। তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে পূর্ববঙ্গে তাদের অবস্থা সম্পর্কে যতটা না সচেতন তার চেয়ে অনেক বেশি পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিরাজমান বৈষম্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উক্ত প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলিম মানুষে ভাবান্তর ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের যতটুকু প্রাপ্তি ঘেটেছে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পিছনে তাদের অবদানই বা কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে তাদের মনে নতুন ভাবনার জন্ম হয়। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তথাকথিত আদর্শ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। এরুপ পরিস্থিতিতে তারা দেখতে পায় তারা শুধু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকেই বঞ্চিত হয়নি; বরং তাদের শ্রমে অর্জিত পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগিত না হয়ে তা পাচার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ ঘটাচ্ছে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়।পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, "ভারত একটি জাতিও নয়" দেশও নয়। ভারতের মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়, বরং তারা একটি জাতি। সেজন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ তাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু ১৯৪০ সালে যখন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। 'দুই পাকিস্তানে' কথা বলা হয়, যার একটি পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে দু'টি পকিস্তান প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব ছিল। লাহোর প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়, যা স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে। সে যা হোক, বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা এতই প্রকট আকার ধারণ করে যে, বাঙালির আদি জাতিসত্তার বন্ধ ও আধুনিক জাতীয়তাবোধের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির যুগপৎ প্রয়াসের ফলে বাঙালি মুসলমানরা প্রথমে নিজেদের পাকিস্তানি বলে ভাবতে শুরু করে। এভাবে দেখা যায় জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব শুধু একটি রাজনৈতিক কূটকৌশল নয়; বরং মুসলিম জীবন ধারার ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে উঠছে বলে ধারণা করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামিকরণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরবিকরণ সমগ্র পাকিস্তানে ধর্মীয় ভিত্তিতে সংহতি সৃষ্টি সহজতর হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রায় সমান উৎসাহ দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও ১৯৫১ সালে আদমশুমারি মতে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পবিত্র কোরআন শরীফ পড়তে পারা লোকসহ প্রায় ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার লোক শিক্ষিত ছিল; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার পবিত্র কোরআন শরীফ পড়তে সক্ষম। ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত এক জরিপ থেকে জানা যায় যে, ঢাকায় অধ্যয়নরত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৯৩ ভাগ মাতৃভাষা বাংলায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে; বাঙালি ছাত্রের শতকরা ৩৫ ভাগ উর্দু পড়তে, লিখতে ও বলতে পারে এবং শতকরা ৩৪ ভাগ আরবি পড়তে ও লিখতে জানে। আর যারা বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারে না তাদের সংখ্যা মাত্র শতকরা দুই ভাগ। অতি উৎসাহীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর আরবি শব্দ চপিয়ে দেয়, যার বিরুদ্ধে প্রথমে তেমন কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হয়নি। এভাবে পশ্চিম বাংলার জনগণের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানদের সাথে বাঙালি উচ্চ শ্রেণির নৈকট্য গড়ে ওঠে।

কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এ আপাতমধুর সম্পর্কের শীঘ্রই সমাপ্তি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ধর্মীয় বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। এর প্রমাণ ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে পবিত্র কোরআন শরীফ পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার সেখানে ১৯৬১ সালে তা ১০ লক্ষ ৭০ হাজারে নেমে আসে। এরুপ পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে জাতি গঠন প্রক্রিয়া নূতন মোড় নেয়। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে এরুপ ধারণার বিকাশ ঘটতে থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি 'অভ্যন্তরীণ কলোনী' ছাড়া অন্য কিছু নয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্নতা যতই বাড়তে থাকে ততই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতি সত্তার উন্মেষ ঘটতে থাকে। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবীর মধ্য দিয়ে এর প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে, যা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রুপ পরিগ্রহ করে। এ যুগান্তকারী

ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তার ব্যাপক প্রসার ঘটে। আজও প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে বাঙালি জাতি নতুন করে জাতি বিনির্মাণ ও একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র গঠনের শপথ গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তার সূচনাসূত্র হচ্ছে বায়ান্নোর মহান ভাষা আন্দোলন। ২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরুপে ঘোষিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদ মিনার জাতীয় ঐক্যের প্রতীক; ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি।

এরুপ নতুন পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ২৩ জুন পূর্ব বাংলায় মজলুম জননেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হককে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রথম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। আর শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকা অবস্থায় উক্ত দলের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার আগে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পাটি পুনর্গঠিত হয়, যার উদ্যোগে তিনটি সংগঠন জন্ম লাভ করে। সংগঠন তিনটি হল: যুবলীগ (মার্চ ১৯৫১), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (এপ্রিল ১৯৫২) এবং গণতন্ত্রী দল (৩১ ডিসেম্বর ১৯৫২)। এ ছাড়া, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বের ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রজা পার্টি ১৯৫৩ সালের ২৯ জুলাই কৃষক-শ্রমিক পার্টি নূতন নামে আত্মপ্রকাশ করে। এসব সংগঠন উদার, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি র‍্যাডিকেল মোড় নেয়, যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে। উক্ত নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা. এ. কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ ২১-দফা প্রণয়ন করে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রগতিশীল ধারায় পরিচালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটি পূর্ব বাংলার র‍্যাডিকেল মুসলিম বুদ্ধিজীবী, ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি, ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। চরম নির্যাতন চালিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি। পঞ্চাশের দশকে সূচিত স্বাধিকার সংগ্রাম ১৯৬২ সালের দুর্বার শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ছয়-দফা এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মার্চ মাসে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। আর এ সকল আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যমণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাকে স্থায়ী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে তাজউদ্দিন আহমদের প্রধানমন্ত্রীত্বে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে রাষ্ট্ররুপে আত্মপ্রকাশ করে, যার অবিসংবাদিত নেতা ও স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রহমান ইতিহাসের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শেখ নজরুল কর্তৃক সম্পাদিত ‘বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি’ গ্রন্থ হতে সংগৃহীত